বাংলাদেশে নারী চিত্রশিল্পীদের অবস্থান

কনকচাঁপা চাকমা

যখন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চারুকলা শিক্ষার সূচনা হলো ১৯৪৮ সালে, সেই প্রারম্ভিক অবস্থাটা কেমন ছিল তা একবার ফিরে দেখা যেতে পারে। জয়নুল আবেদীনকে সহযোগিতা করার জন্য তখন যে চারজন শিল্পী এগিয়ে এসেছিলেন এবং একত্রে কাজ করেছিলেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন পুরুষ। সেই সময় বাংলাদেশে তেমন কোনো নারী চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর ছিলেন না। ফলে চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে আমরা তাঁদের পাই নি। আবেদীন স্যারের সহযোগী ছিলেন কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক এবং হবিবুর রহমান।

শুরুর দিকের ইতিহাসটি বিশ্লেষণ করলে এদেশের নারী চিত্রশিল্পীদের বর্তমান অবস্থানকে বুঝতে সহজ হবে। আমরা জানি, তদানীন্তন সমাজ বাস্তবতায় মেয়েদের ছবি আঁকা চর্চার বিষয়টা তো দূরের কথা— সাহিত্য চর্চা, সংগীত চর্চাও একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। যাই হোক, বাংলাদেশের এই সমাজ বাস্তবতায় জয়নুল আবেদীনের হাত ধরে চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলো। আমি বলব, বিচক্ষণ জয়নুল আবেদীন একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন; তাঁর দূরদর্শী চিন্তার কারণে শুরু থেকেই চারুকলায় ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েশিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যদিও ছেলেশিক্ষার্থীদের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য, মাত্র এক থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত। চারুকলার প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন তাহেরা খানম, মইনা আহসান, জোবেদা ইসলাম। এর পরে প্রতি ব্যাচে মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে, উৎসাহী হয়েছে অনেক মেয়ে চারুকলায় শিক্ষা গ্রহণ করতে।

তারও অনেক দিন পরে, আমি যখন ম্যাট্রিক পাস করে চারুকলায় অধ্যয়ন শুরু করলাম, তখন ১৯৭৮ সাল। আমাদের ক্লাসের ৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে আমরা ছিলাম ১৫ জন। অর্থাৎ খুব ধীরগতিতে হলেও মেয়েদের শিল্পচর্চার পথটি ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে ততদিনে অনেকখানি প্রসারিত হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পেলাম, চাকুরি ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী চিত্রশিল্পীরা কর্মরত রয়েছেন। নকশাবিদ হিসেবে, সেট ডিজাইনার ও পত্রিকা অফিসের অলংকরণ কাজে, সরকারি/বেসরকারি স্কুলগুলোতে শিল্পকলার শিক্ষক হিসেবে, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, শিল্পকলা একাডেমী, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে নারীশিল্পীরা ততদিনে কাজ করতে শুরু করেছেন নিষ্ঠার সাথে।

সভ্যতা যতই অগ্রসর হোক, লালসাপূর্ণ পুরুষমন তার কুদৃষ্টিকে এখনো বদলাতে পারে নি। কেবল বাংলাদেশেই নয়, সারাবিশ্বেই মেয়েরা কখনো না কখনো কোনো না কোনোভাবে লাঞ্ছিত হয় ও হচ্ছে। সকল পুরুষই যে খারাপ তা নয়। যে কারণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বিভাগে যখন মেয়েদের কম-বেশি নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে দেখি, তখনো চারুকলার পরিবেশকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক নারীবান্ধব ও সহযোগী মনে হয়। এখানে ছেলেদের সহযোগিতায় মেয়েরা নিশ্চিন্তে আউটডোরের কাজ করতে পারে। আশার কথা যে, এই পরিবেশ আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনই আছে।

তবে বৈষম্যের বিষয়টি এখানেও খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে রয়ে যায়; যেমন বিদেশে উচ্চশিক্ষাবৃত্তি পাবার ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেদের প্রাধান্য। এ ব্যাপারে খোঁজখবর করলে জানা যায় একটা গড় ধারণার কথা। বলা হয়, মেয়েরা চারুকলা থেকে পাস করেও তেমন শিল্পচর্চা করে না। তারা বিয়ের পর ঘরসংসার করে, শিল্পী হয় না। একজন পরিপূর্ণ শিল্পী হতে হলে তাকে অবশ্যই চর্চা অব্যাহত রাখতে হয়। সেজন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার। নারী চিত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রে সেই পরিবেশ পাওয়া সব সময় সহজ হয় না। নির্ভর করে সে বিয়ের পরে কোন মানসিকতার মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন করছে তার ওপর।

আমাদের সমাজে বিয়ের পর সাধারণত স্বামীর পরিবারের সমস্ত গার্হস্থ্য কাজ মেয়েদের কাঁধে চেপে বসে। তার ওপর যখন কোলে একটা সন্তান আসে, তখন ওই সন্তান লালনপালনের দায়ও প্রায় পুরোটাই বর্তায় মায়ের ওপর। একজন চিত্রশিল্পীকে শিল্পী হিসেবে বিকশিত হতে হলে পড়াশোনা ও চর্চার জন্য যে পরিমাণ সময় ও অবকাশ দরকার হয়, পরিবারে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ক্রিয়াশীল না-থাকলে এবং পুনরুৎপাদনমূলক কাজের ভার সবাই মিলে বহন করবার রেওয়াজ অনুপস্থিত থাকলে সে পরিবারের একজন নারী চিত্রশিল্পী প্রয়োজনীয় সময় ও শারীরিক মানসিক অবকাশ পান না। এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মেয়েরা শিল্পীদের রেসে পিছিয়ে পড়ে। এভাবেই সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার অভাবে অনেক মেধাবী মেয়ে চারুকলায় ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও হারিয়ে গেছে। ফলে আমাদের শিল্পাঙ্গনে মেয়েদের পদচারণা কম দেখা যায়। এ কারণেই অন্য দশজন পুরুষ শিল্পীর চেয়ে নারী চিত্রশিল্পীদের কাজ কম দৃশ্যমান হয়। এর মধ্যেও যাঁরা টিকে থাকেন, তাঁদের অনেককে এই প্রতিকূল সমাজ বাস্তবতাকে মোকাবেলা করেই টিকে থাকতে হয়। তাছাড়া এক সময় বলা হতো, মেয়েদের কাজ দুর্বল, যোগ্যতায়ও তাদের সমমানের ধরা হতো না। এসব মিলিয়ে এমনও বলা হতো যে, মেয়েরা চারুকলায় সিট নষ্ট করতে আসে, পাস করার পর তারা কাজ করে না। সুতরাং তার বিপরীতে ওই জায়গায় একজন ছেলেকে নিলে সে হয়ত এই অঙ্গনে টিকে যেত।

ষাট, সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে শিল্পাঙ্গনের এই দৃশ্যপট পালটাতে শুরু করে। আমরা যখন বিএসএফ শেষপর্বের শিক্ষার্থী, তখন নারী চিত্রশিল্পীদের কয়েকজন কৃতিত্বের সঙ্গে দেশের চারুকলার অঙ্গন পেরিয়ে, বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে চারুকলায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা জামান, নাইমা হক, নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা প্রমুখ। পাশাপাশি অন্য জেলাগুলোতেও চারুশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক হিসেবে নারী চিত্রশিল্পীদের যুক্ততা প্রসারিত হতে থাকে।

আমরা তখন দেখেছি, বেশির ভাগ পুরুষশিল্পীর ধারণা ছিল নারীরা তেমন উচ্চ পর্যায়ের শিল্পী হয় না। এমনকি তৎকালীন অধ্যক্ষ, যিনি জয়নুল আবেদীনের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন, আমাদের

সকলের প্রিয় বরেণ্য শিল্পী আমিনুল ইসলাম স্যার, তিনিও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন— মেয়েরা ভালো শিল্পী হয় না। পৃথিবীতে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, নারী হয়েও যিনি বিখ্যাত শিল্পী। সেজন্য তিনি হয়ত মেয়েদের সুযোগ দিতে বেশি উৎসাহী ছিলেন না। এই ভুল ভাঙাতে আমার সময় লেগেছিল দীর্ঘ ১২ বছর। ১৯৯২ সালে নিউইয়র্কের এক আর্টবুকের দোকানে পেয়ে গেলাম বিশ্বের উল্লেখ্যযোগ্য নারী চিত্রশিল্পীদের ওপর লিখিত একমাত্র বই। সাথে সাথে স্যারের কথা মনে পড়ে গেল। বইটি নিয়ে এলাম। স্যারের সঙ্গে আমাদের বাসার এক আড্ডায় তাঁকে বইটি দেখালাম। স্যার বইটি দেখে বলেছিলেন, বাহ্, এত ভালো নারীশিল্পী রয়েছে, মেয়েরা এত কাজ করছে, জানা ছিল না। খুব ভালো লেগেছিল এই জন্যে যে, আমাদের দেশের একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্পীর মনে দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা মেঘগুলো আমি সরাতে পেরেছিলাম!

আমাদের আগের প্রজন্ম ও পরের প্রজন্মের নারী চিত্রশিল্পীরা চমৎকারভাবে বাংলাদেশের শিল্পকলার জগতে একটি প্লাটফরম তৈরি করতে পেরেছেন। দেশ-বিদেশের প্রদর্শনীগুলোতে অংশগ্রহণ ছাড়াও উচ্চশিক্ষার বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়াশোনা, গবেষণা কাজ, পিএইচডি লাভ, সবক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান অত্যন্ত জোরালো। পাস করার পর মেয়েরা কাজ করে না, বিয়ের পর তারা হারিয়ে যায়, এই কথাগুলো এখন আর প্রযোজ্য নয়। এখন নারী চিত্রশিল্পীদের উপস্থিতি একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে। এখন সময় এসেছে বলার এবং বলছেও অনেকে যে, অনেক নারীর কাজ দেখে মনেও হয় না এটা নারী চিত্রশিল্পীর কাজ।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব পুরুষ শিল্পীই সমমনা তা বলা যাবে না। তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বাল্যকাল থেকে বৈষম্যপূর্ণ ও অগণতান্ত্রিক পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা, ইত্যাদি কারণে তাঁরা নারী সহশিল্পীদের দেখবার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে আসতে পারেন না। তাঁরা হামেশাই নারী এবং পুরুষ শিল্পী হিসেবে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু যখন একটি শিল্পকর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে ক্যানভাসে বা ভাস্কর্যে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে তখন কি শিল্পকর্মটির গায়ে লেখা থাকে শিল্পী কোন লিঙ্গের?

আমি মনে করি, একজন চারুশিল্পী তাঁর সৃষ্টির যোগ্যতায় এগিয়ে যাবেন। তাঁর মাপকাঠি হবে একমাত্র তাঁর কাজ। তিনি কোন লিঙ্গের এটা তাঁর কাজের ভালোমন্দের কোনো মাপকাঠি হতে পারে না। তবে কেবল নারীশিল্পীরা ভালো আর পুরুষশিল্পীরা খারাপ এটাও ঠিক নয়। দেখা যায়, কোনো কোনো নারীশিল্পী যখন তাঁর শিল্পকর্মকে বাজারজাত না-করে নিজেকে বিকশিত করার প্রক্রিয়ায়ই ব্যস্ত থাকেন, তখন কাজের অবমূল্যায়ন করা হয়। তখন শিল্পকলার সংজ্ঞাটি পালটে যায়।

এখন আমরা স্বাধীন। আমাদের জন্য আমরা এখন ক্ষেত্র তৈরি করতে পেরেছি, যে ক্ষেত্র থেকে নারীরা তাঁদের শিল্পাঙ্গনকে আরো প্রসারিত করতে পারবেন। এখন আমরা ভীত নই— আমাদের কাজ নিয়ে, আমাদের যোগ্যতা নিয়ে আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারি, শিল্পকলার বর্তমান ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে নারীশিল্পীদের অবস্থানকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

কনকচাঁপা চাকমা বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য।